CENTRE FOR HEALTH AND POPULATION RESEARCH

HSB

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা

বর্ষ ১ সংখ্যা ৫ আইএসএসএন ১৭২৯-৩৪৩এক্স ডিসেম্বর ২০০৩

ভিতরের পাতায় ...

৬ বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে আত্মহত্যাজনিত মৃত্যুহার

১০ নিউমোনিয়ার চিকিৎসায় স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে বিলম্বের সামাজিক ও লৌকিক প্রেক্ষাপট

১৫ সতর্কবার্তাঃ বাংলাদেশে মাল্টিড্রাগ-রেজিস্ট্যান্ট (একাধিক ওষুধ-প্রতিরোধকারী) *শিগেলা ডিসেন্টারী* টাইপ ১-এর বিবর্তন – সম্ভাব্য মহামারীর প্রতি অব্যাহত সতর্ক দৃষ্টি রাখার প্রয়োজনীয়তা

১৭ সর্বশেষ পর্যবেক্ষণ

নিপা/হেন্দ্রা ভাইরাসের ফলে বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে এনসেফালাইটিসের প্রাদুর্ভাব

বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের দু'টি ভিন্ন স্থানে ২০০১ এবং ২০০৩ সালে এনসেফালাইটিসের দু'টি প্রাদুর্ভাবই নিপা/হেন্দ্রা-সদৃশ ভাইরাস দ্বারা সংঘটিত হয়। উভয় প্রাদুর্ভাবই স্বল্প-সময় ধরে চলে এবং তাতে মৃতের আনুপাতিক হার ছিলো অনেক। বাংলাদেশে সংঘটিত প্রাদুর্ভাবের রোগতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য থেকে বোঝা যায় যে, ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির মধ্যে সংক্রমণের মধ্য দিয়ে এ-রোগের বিস্তারের সম্ভাবনা রয়েছে যা অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া এবং সিংগাপুরে হেন্দ্রা এবং নিপা ভাইরাস দ্বারা সংঘটিত ইতোপূর্বেকার প্রাদুর্ভাবের অভিজ্ঞতার ঠিক বিপরীত, কারণ ঐ প্রাদুর্ভাবগুলোর সময় ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির মধ্যে এ-রোগের বিস্তার ঘটে নি। প্রাদুর্ভাবের সময় হয়তো পশু-পাখির সংস্পর্শ থেকে মানুষের মধ্যে এ-রোগের বিস্তার ঘটে থাকতে পারে। তবে তা সত্ত্বেও এ-ভাইরাসের প্রকৃত উৎস হচ্ছে ভাইরাসটির ধারণকারী বিভিন্ন ধরনের পশু-পাখি।

২০০১ সালের ২৬ এপ্রিল থেকে ২৬ মে-এর মধ্যে ভারত সীমান্ত থেকে ১৭ কি:মি: বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মেহেরপুর জেলার চাঁদপুর গ্রামের কিছু অধিবাসীর মধ্যে জ্বর এবং স্নায়ুতন্ত্রের দুর্বলতা-সংক্রান্ত রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার পর ৯ ব্যক্তি মারা যায়। এদের মধ্যে ৭ জন ছিলো একই পরিবারের, যারা একসংগে একই বাড়িতে অথবা সংলগ্ন বাড়িতে বসবাস করত। এদের গড় বয়স ছিলো ৪০ বছর (৩২-৬০ বছরের মধ্যে) এবং ৬ জন ছিলো পুরুষ। একই সময়ের মধ্যে অনুরূপ রোগে ঐ গ্রামের আরো ১৮ জন অধিবাসী অসুস্থ হয়ে পড়ে, তবে তারা সবাই বেঁচে যায়।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহা-পরিচালকের নেতৃত্বে ২০০১ সালের মে মাসে উক্ত রোগের কারণ উদঘাটনের জন্য একটি তদন্ত পরিচালিত হয়। এর অব্যবহিত পর ২৬ মে থেকে ১ জুন পর্যন্ত স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং আইসিডিডিআর,বি-এর গবেষণা-কর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি দল দ্বিতীয়বারের মত অনুসন্ধান চালায়। সে-সময় এনজাইম-লিংকড ইম্মিউনোএ্যাসে (এলিসা) দ্বারা এন্টিবডি পরীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, চাঁদপুরের প্রাদুর্ভাবে আক্রান্ত লোকদের মধ্যে কমপক্ষে ২ জন নিপা/হেন্দ্রা-সদৃশ কোনো ভাইরাসে আক্রান্ত ছিলো।

আইসিডিডিআর,বি:
সেন্টার ফর হেল্‌থ এ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ
জিপিও বক্স ১২৮
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
www.icddrb.org

নওগাঁ জেলার (রাজশাহী থেকে ৪৫ কি:মি: উত্তর-পূর্বে) চকসিতা এবং বিলজোয়ানিয়া গ্রামে ২০০৩ সালের ১১ থেকে ২৮ জানুয়ারীর মধ্যে এনসেফালাইটিসের বৈশিষ্ট্যসহ মারাত্মক অসুস্থতা-সম্বলিত আরো একটি রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়, যার ফলে ১৭ জন গ্রামবাসী (৪-৪২ বছর-বয়সী) আক্রান্ত হয় এবং তাদের ৮ জন মারা যায়।

আইসিডিডিআর,বি এবং যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় অবস্থিত সেন্টারস্ ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি-আটলান্টা)-এর সমন্বয়ে গঠিত একটি অনুসন্ধানী দল ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রথম প্রাদুর্ভাবের পরিধি এবং এর ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়গুলি সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানার জন্য পুনরায় চাঁদপুরে আসে। চাঁদপুরে তাঁদের তদন্ত শেষ করে দ্বিতীয় প্রাদুর্ভাবের কারণ ও তার পরিসর নির্ণয়ের জন্য উল্লেখিত দলটি নওগাঁ জেলার প্রাদুর্ভাব-কবলিত এলাকা পরিদর্শন করে।

দু'টি প্রাদুর্ভাবের কোনো একটিতে আক্রান্ত হওয়ার পর সেরে উঠেছে এবং যারা মৃত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসেছে (মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্য, ঘনিষ্টজন ও প্রতিবেশী), চাঁদপুর গ্রামের এমন ১১৯ জনের কাছ থেকে এবং চকসিতা ও বিলজোয়ানিয়া গ্রামের ৮৯ জনের কাছ থেকে অনুসন্ধানী দলটি রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে।

চাঁদপুর থেকে প্রাপ্ত নমুনাসমূহের মধ্যে ৪ জনের রক্তে নিপা ভাইরাস এন্টিজেনের এন্টিবডি পাওয়া গেছে (এলিসা দ্বারা পরীক্ষিত)। এ-চার জনের সবাই প্রাদুর্ভাব চলাকালীন সময়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং সকলেই মৃত রোগীদের আত্মীয়-স্বজন ছিলো। একইভাবে চকসিতা এবং বিলজোয়ানিয়ার চার জন অধিবাসীর কাছ থেকে নিপা ভাইরাস-এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল এন্টিবডি পাওয়া গেছে। এ-চার জনের সবাই অসুস্থ ছিলো এবং মৃত রোগীদের সংস্পর্শে এসেছিলো। কোনো প্রাদুর্ভাবের সময়ই স্বাস্থ্য-সেবাপ্রদানকারী কেউ অনুরূপ রোগে আক্রান্ত হয় নি।

চিত্র ১: ২০০১ সালে মেহেরপুরে নিপা/হেন্দ্রা-সদৃশ ভাইরাস-আক্রান্ত রোগীদের (কেস) অসুস্থতা শুরু হওয়ার তারিখ

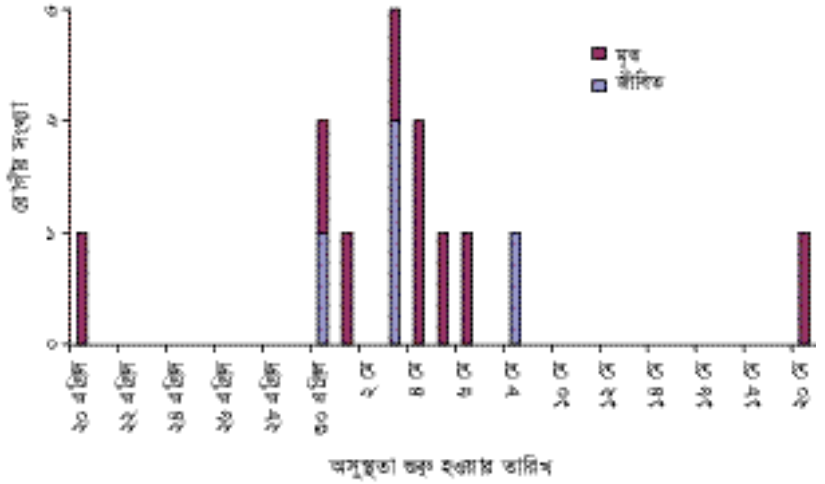

যে দু'টি গ্রামে নিপা/হেন্দ্রা-সদৃশ ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট রোগের প্রাদুর্ভাব সংঘটিত হয়েছে, সেখানকার কোনো অধিবাসী প্রাদুর্ভাবের সময় মারা গিয়ে থাকলে, অথবা কারো রক্তে পরিমাপ করার মত নিপা ভাইরাস এন্টিজেনের এন্টিবডি পাওয়া গেলে তাকে নিপা/হেন্দ্রা ভাইরাস-আক্রান্ত রোগী হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রথম প্রাদুর্ভাবের সময় মোট ১৩ জন রোগী (কেস) (৯ জন মৃত ব্যক্তিসহ) এবং দ্বিতীয় প্রাদুর্ভাবের সময় ১২ জন রোগী (৮ জন মৃত ব্যক্তিসহ) সনাক্ত করা হয় (চিত্র ১ ও ২)।

চিত্র ২: ২০০৩ সালে নওগাঁয় নিপা/হেন্দ্রা-সদৃশ ভাইরাস-আক্রান্ত রোগীদের (কেস) অসুস্থতা শুরু হওয়ার তারিখ

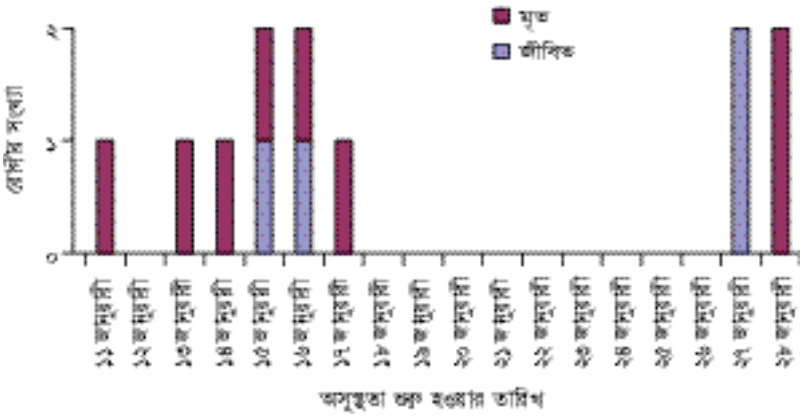

মেহেরপুরে প্রথম রোগীটি অসুস্থ হয় ২০০১ সালের ২০ এপ্রিল এবং এরপর ৮ মে পর্যন্ত ১১ জন এবং ২০ মে আরো ১ জন অসুস্থ হয়ে পড়ে (চিত্র ১)। জ্বর শুরু হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মধ্য-স্থিতিকাল (median duration) ছিলো ৬ দিন (ব্যাপ্তি ৩-৯ দিন)। নওগায় প্রথম ব্যক্তি আক্রান্ত হয় ১১ জানুয়ারী এবং এর পরপরই খুব দ্রুত একসঙ্গে ৭ জন অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রথম সংক্রমণে সর্বশেষ আক্রান্ত রোগীর আক্রান্ত হওয়ার ১০ দিন পর দ্বিতীয় দফা সংক্রমণ শুরু হয় এবং এতে একসাথে ৪ জন অসুস্থ হয়ে পড়ে (চিত্র ২)।

জ্বর, মাথাব্যথা এবং বোধশক্তি বা চেতনার পরিবর্তন ছিলো নিপা-সংক্রমণের প্রধান লক্ষণসমূহ (সারণী ১)। নওগাঁয় যারা উল্লেখিত ভাইরাসে আক্রান্ত হয় নি তাদের তুলনায় সেখানকার প্রাদুর্ভাবে আক্রান্ত রোগীদের তাদের গ্রামের মধ্য দিয়ে যাওয়া একপাল শুকরের সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা বেশি বলে মনে হয়েছে (সারণী ২)। মেহেরপুরের প্রাদুর্ভাবের রোগীগুলো তাদের অসুস্থ হওয়ার পূর্বের দু'সপ্তাহের মধ্যে অনাক্রান্তদের তুলনায় একটি গরুর সান্নিধ্যে বেশি এসেছিলো। এ-রোগীগুলোর ক্ষেত্রে দেখা গেছে তারা অনাক্রান্ত ব্যক্তিদের তুলনায় পূর্বে আক্রান্ত রোগীদের দেহ থেকে নিঃসৃত তরল পদার্থের সংস্পর্শে আসাসহ তাদের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে সাধারণত বেশি এসেছে।

সারণী ১: নিশ্চিত বলে প্রতীয়মান এনসেফালাইটিস-এ আক্রান্ত রোগীদের রোগতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য (জেলাভিত্তিক)

	মেহেপুর মোট =১৩	নওগাঁ মোট=১২
লক্ষণসমূহ	**সংখ্যা (%)**	**সংখ্যা (%)**
জ্বর	১৩ (১০০)	১২ (১০০)
মাথাব্যথা	৮ (৬২)	১০ (৮৩)
সচেতনতার পরিবর্তন	১৩ (১০০)	১০ (৮৩)
ঘুমঘুম ভাব	প্রযোজ্য নয়	৪ (৩৩)
খিচুনী	৩ (২৩)	৩ (২৫)
কাশি	১০ (৭৭)	৬ (৫০)
শ্বাস নিতে কষ্ট-হওয়া	৯ (৬৯)	৭ (৫৮)
রক্তক্ষরণ (নাক, মুখ, কাশি/কফ)	৩ (২৩)	৪ (৩৩)
বমি-হওয়া	৭ (৫৪)	৬ (৫০)
ডায়রিয়া	২ (১৫)	১ (৮)
ফোকাল দুর্বলতা	প্রযোজ্য নয়	২ (১২)
রোগের শুরু থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের ব্যাপ্তি (রেঞ্জ)	৬ (৩-৯)	৪ (২-৭)

সারণী ২: দু'টি প্রাদুর্ভাবের অনুসন্ধানে প্রাপ্ত নিপা ভাইরাস এনসেফালাইটিস-এর সাথে সম্পর্কিত কারণসমূহ

	মেহেরপুর				নওগাঁ			
অসুস্থ রোগী/পশুর সাথে যোগাযোগ	রোগী/কেস মোট=১৩ (%)	রোগী নয় মোট=১০৪ (%)	ওআর (৯৫% নির্ভরযোগ্যতা)	পি	রোগী/কেস মোট=১২ (%)	রোগী নয় মোট=৭৭ (%)	ওআর (৯৫% নির্ভরযোগ্যতা)	পি
যেসব অসুস্থ ব্যক্তির যত্ন নেওয়া হয়েছে	৭৬.৯	২৬.৯	৯.০ (২.১-৩৮.৬)	<০.০০১		প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
যারা অসুস্থ ব্যক্তিদের সাথে জিনিস-পত্র ভাগাভাগি করেছে	৫৩.৮	২৩.১	৩.৯ (১.২-১৩.১)	০.০১৮	২৭.৩	২৭.৬	১.০ (০.২-৪.১)	০.৯৮০
যারা অসুস্থ ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছে	৭৬.৯	২৬.০	৯.৫ (২.২-৪০.৮)	<০.০০১	৪১.৭	৪২.১	১.০ (০.২-৩.৪)	০.৯৭৭
যারা অসুস্থ ব্যক্তির দেহ থেকে নিঃসৃত রসের সংস্পর্শে এসেছে (মোট=১২)	৫৮.৩	১০.৬	১১.৮ (২.৮-৪৯.৬)	<০.০০১	৮.৩	১৩.২	০.৬ (০.১-৫.২)	০.৬৪১
অসুস্থ ব্যক্তির কফ যাদের মুখমন্ডলে লেগেছে	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	২৫.০	৭.৯	৩.৯ (০.৮-১৯.১)	০.০৭১
যারা গরুর সংস্পর্শে এসেছে	৬১.৫	১৭.৩	৭.৬ (২.১-২৮.৩)	<০.০০১	০.০	৮.০	-	১.০০০
যারা শুকরের পালের সংস্পর্শে এসেছে	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	৭০.০	২৭.৬	৬.১ (১.৩-২৭.৮)	০.০০৭

যে ভাইরাস দ্বারা এই প্রাদুর্ভাবগুলি দেখা দিয়েছিলো তার উৎস খুঁজে পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রাণী থেকে রক্তের সিরাম সংগ্রহ করা হয়। চুয়াল্লিশটি *টারোপাস জিগান্টাস* বাদুড় পরীক্ষা করে ২টির মধ্যে নিপা ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল এন্টিবডি পাওয়া গেছে। অথচ আক্রান্ত রোগীর বাড়ির নিকটস্থ এলাকায় অবস্থানকারী বাদুড়ের অন্য ২টি প্রজাতিসহ শুকর, ইঁদুর, ছুঁচো, কবুতর এবং কুকুরসহ অন্যান্য প্রাণীর সিরাম পরীক্ষা করে অনুরূপ কোনো এন্টিবডি পাওয়া যায় নি।

তথ্যসূত্র: ডিভিশন অব ভাইরাল এন্ড রিকেটসিয়াল ডিজিজেস, ন্যাশনাল সেন্টারস্ ফর ইনফেকশাস ডিজিজেস, সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশন, ইউএসএ; হেল্‌থ সিস্টেমস এন্ড ইনফেকশাস্ ডিজিজেস ডিভিশন এবং ক্লিনিক্যাল সায়েন্সেস ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকূল্য: সেন্টারস্ ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশন, ইউএসএ

মন্তব্য

এ-প্রতিবেদনের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে উল্লেখিত দু'টি প্রাদুর্ভাবই নিপা/হেন্দ্রা ভাইরাসের মতো রোগ-জীবাণু দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। দু'টি প্রাদুর্ভাবেই যেহেতু রোগ-নির্ণয়ের বিষয়টি শুধুমাত্র রক্ত পরীক্ষার ওপর নির্ভরশীল ছিলো, সেহেতু রোগের সুনির্দিষ্ট জীবাণু সম্বন্ধে জানা যায় নি এবং গবেষণাগারে এন্টিবডি এ্যাসে পরীক্ষা করার সময় নিপা ভাইরাস এন্টিজেনের সাথে অনুরূপ কোনো রোগ-জীবাণুর এন্টিবডির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলেও সঠিক কারণটি জানা নাও যেতে পারে।

হেন্দ্রা এবং নিপা ভাইরাস-সংক্রান্ত রোগ প্রথম ধরা পড়ে ১৯৯৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার প্রাদুর্ভাবে এবং ১৯৯৮-১৯৯৯ সালে মালয়েশিয়া ও সিংগাপুরে সংঘটিত মহামারীর সময় (১,২)। মালয়েশিয়া এবং সিংগাপুরে গবেষণাগারের পরীক্ষায় নিশ্চিত বলে প্রতীয়মান নিপা ভাইরাস-আক্রান্ত রোগীর ২৭৬ জনের মধ্যে ১০৫ জন ভাইরাল এনসেফালাইটিসে মারা যায়। মানুষের মধ্যে এ-রোগের সবচেয়ে বড় কারণ ছিলো অসুস্থ শুকরের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে আসা (৩-৫)। তবে কিছু রোগী ছিলো যারা সরাসরি শুকরের সংস্পর্শে আসে নি (৩)। সেখানে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির মধ্যে সংক্রমণের কোনো লক্ষণ দেখা যায় নি (৪-৬)।

হেন্দ্রা এবং নিপা ভাইরাসের ধারক হচ্ছে *টারোপাস* গোত্রভুক্ত একধরনের বাদুড়। অস্ট্রেলিয়ায় মানুষের মধ্যে এ-ভাইরাস সংক্রমণের সাথে গৃহপালিত ঘোড়ার একটি সম্পর্ক ছিলো। তবে মালয়েশিয়া ও সিংগাপুরের সংক্রমণের সাথে শুকরের সম্পর্ক ছিলো পরিষ্কার। অন্যান্য জীব-জন্তু (কুকুর, বিড়াল এবং ঘোড়া)-এর মধ্যে নিপা ভাইরাস এন্টিবডি পাওয়া গিয়েছিলো (৭-৯), তবে এসব জীব-জন্তু থেকে মানুষের দেহে এ-ভাইরাস সংক্রমণের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। এর পরপরই ক্যাম্বোডিয়ায় পরিচালিত কিছু সমীক্ষায় আপাতদৃষ্টিতে স্বাস্থ্যবান বাদুড়ের দেহে নিপা/হেন্দ্রা-সদৃশ ভাইরাস পাওয়া যেতে পারে বলে মনে হয়েছে (১০)। মালয়েশিয়ায় ১০ লাখের বেশি শুকর হত্যা করার পর সেখানে নিপা ভাইরাস-আক্রান্ত কোনো রোগী সনাক্ত করা যায় নি।

এ-প্রতিবেদনের সারমর্ম থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশে সংঘটিত দু'টি প্রাদুর্ভাবের কোনোটি থেকেই এ-রোগ সংক্রমণের নির্দিষ্ট কোনো উৎস পাওয়া যায় নি, যা অস্ট্রেলিয়া এবং মালয়েশিয়া/সিংগাপুরের প্রাদুর্ভাবের ঠিক বিপরীত। তবে যেহেতু রোগটি একই পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো; কারো মধ্যে কোনো অসুস্থতা পরিলক্ষিত হয় নি – এমন একটি সময়ের পরেই যখন দ্বিতীয় পর্যায়ের সর্বোচ্চ রোগাক্রান্তের ঘটনা ঘটেছে এবং রোগতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে

যেখানে দেহ থেকে তরল পদার্থ নিঃসৃত হওয়া রোগীর সংস্পর্শে-আসা মানুষের মধ্যে রোগাক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি বলে প্রতীয়মান হয়েছে; সেখানে পারস্পরিক সংস্পর্শে এ-রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে স্বাস্থ্য-সেবাদানকারীদের মধ্যে এ-রোগের অনুপস্থিতি এ-সম্ভাবনাকে অনিশ্চিত করে তোলে। এক প্রাদুর্ভাবে শুকরের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে এবং অন্য প্রাদুর্ভাবে অসুস্থ গরুর সংস্পর্শে আগমনকারীদের মধ্যে এ-রোগের ঝুঁকি বেশি থাকার দরুন পশু থেকে মানুষের মধ্যে এ-রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে, তবে এ-সংক্রান্ত সীমিত উপাত্তের ফলে একে যথার্থ বলে ধরে নেওয়া যাবে না।

বাংলাদেশে এনসেফালাইটিসের ওপর নিয়মমাফিক পদ্ধতিগত কোনো পর্যবেক্ষণ হয় না। নিপা/হেন্দ্রার মতো ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট এনসেফালাইটিস প্রাদুর্ভাব আকারে অথবা বিক্ষিপ্তভাবে কোথাও না কোথাও ঘটে থাকতে পারে অথবা ভবিষ্যতে ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। এ-রোগ-সংক্রান্ত সমস্যার ব্যাপকতা নির্ণয়ের জন্য এবং রোগের আক্রমণ ও মৃত্যু রোধকল্পে প্রয়োজনীয় কলা-কৌশল উদ্ভাবনের নিমিত্তে আরো তথ্যাবলি প্রয়োজন। বাংলাদেশে এনসেফালাইটিস রোগের বিবরণ এবং এর কারণ নির্ণয়ের জন্য আইসিডিডিআর,বি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সাথে একযোগে হাসপাতাল-ভিত্তিক একটি পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। বিক্ষিপ্তভাবে রোগ-ব্যাধি সৃষ্টিতে নিপা/হেন্দ্রার মতো ভাইরাস কী-ভূমিকা পালন করে তা নির্ণয় করার জন্য এবং এ-ভাইরাসের দ্বারা সৃষ্ট মারাত্মক রোগের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও রোগ-প্রতিরোধে সঠিক পদ্ধতি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে এই পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি সাহায্য করতে পারে।

বি: দ্র: তথ্য-নির্দেশের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে আত্মহত্যাজনিত মৃত্যুহার

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি গ্রামীণ এলাকায় জনসংখ্যা-ভিত্তিক এক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, সেখানে মৃত্যুর একটা বড় কারণ হচ্ছে আত্মহত্যা, বিশেষ করে যুবতীদের মধ্যে। ১৯৮৩ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত সেখানে আত্মহত্যাজনিত বাৎসরিক গড় মৃত্যুহার ছিলো প্রতি ১ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে ৩৯.৬ জন। দশ থেকে ঊনিশ বছর-বয়সী তরুণদের মধ্যে আত্মহত্যাজনিত কারণে মৃত্যুহার ছিলো ৪২%। আবার এ-বয়সশ্রেণীতে যুবতীদের মধ্যে উল্লেখিত কারণে মৃত্যুহার ছিলো ৮৯%। এশিয়ার অন্যান্য স্থানের তুলনায় বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত উল্লেখিত পর্যবেক্ষণ এলাকায় আত্মহত্যাজনিত মৃত্যুহার অনেক বেশি। তাই আত্মহত্যার ঝুঁকিসমূহ বের করে আত্মহত্যা রোধকল্পে প্রয়োজনীয় কলা-কৌশল নির্ধারণ করার জন্য আরো সমীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।

সারা পৃথিবীতে ১৫-৪৪ বছর-বয়সী মানুষের মৃত্যুর প্রধান তিনটি কারণের মধ্যে আত্মহত্যা অন্যতম (১)। ১৯৮৩-২০০২ পর্যন্ত বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত যশোর জেলার অন্তর্গত অভয়নগর এবং কেশবপুর উপজেলার মানুষের মধ্যে আত্মহত্যা এবং অন্যান্য উপায়ে মৃত্যুর কারণ ও এর বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্ধারণের জন্য সেখানকার ৬,৯৫৩টি বাড়ি থেকে ধারাবাহিকভাবে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা-সম্পর্কিত উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। উল্লেখিত এলাকাসমূহে ৩,২৩৭ জনের মৃত্যুর সম্ভাব্য কারণ খুঁজে বের করার জন্য তাদের পরিবারের লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে একটা মানসম্পন্ন উপাত্ত-সংগ্রহ ফরম পূরণের মাধ্যমে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এদের মধ্যে ২,০৬১ জন মৃতব্যক্তির বয়স ছিলো ১০ বছর বা তার চেয়ে বেশি এবং ১৬১ জনের (৮%) মৃত্যু হয়েছিলো আত্মহত্যাজনিত কারণে, যা স্ব-প্ররোচিত মৃত্যু হিসাবে পরিগণিত। সবধরনের মৃত্যুর কারণগুলোর মধ্যে আত্মহত্যা হচ্ছে পঞ্চম প্রধান কারণ, এবং কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে (১০-১৯ বছর বয়সের) এক নম্বর কারণ।

গত ২০ বছরের হিসাবে দেখা যায় যে, প্রতি এক লক্ষ লোকের মধ্যে বছরে ৩৯.৬ জন মারা গেছে আত্মহত্যাজনিত কারণে (বাৎসরিক হার ১০.৭-১১৯.৫ এর মধ্যে)। এ-হার প্রতি এক লাখে ৬১.০ জন ছিলো ১০-১৯ বছর-বয়সীদের মধ্যে, ৪২.০ জন ছিলো ২০-২৯ বছর-বয়সীদের মধ্যে, ২৪.৫ জন ছিলো ৩০-৩৯ বছর-বয়সীদের মধ্যে এবং ২১.৭ জন ছিলো ৪০ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সীদের মধ্যে। আত্মহত্যার সবচেয়ে সাধারণ মাধ্যমগুলোর মধ্যে 'বিষপান' এবং 'ফাঁসিতে ঝোলা' উল্লেখযোগ্য। মহিলাদের মধ্যে বিষপানে আত্মহত্যার হার ৮৪% এবং পুরুষদের মধ্যে ৭২%।

আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে যারা অল্প-বয়সী তাদের ৪১% ছিলো ১৯ বছর বা তার চেয়ে কম-বয়সী, এর মধ্যে একজন ছিলো ১০ বছর বয়সের শিশু (সারণী ১)। দশ থেকে ঊনিশ বছর বয়সের মোট মৃত্যুর মধ্যে আত্মহত্যাজনিত মৃত্যুহার ছিলো ৪২%। আত্মহত্যাজনিত কারণে মৃত মহিলাদের মধ্যে ৫৪% ছিলো ১৯ বছর বা তার চেয়ে কম-বয়সী, যেখানে পুরুষের সংখ্যা ছিলো ১৫% (আপেক্ষিক ঝুঁকি = ৩.৬; ৯৫% বিশ্বাসযোগ্যতা = ১.৮-৬.৯; পি <০.০০১)। ঊনিশ বছর বা তার চেয়ে কম-বয়সী ৬৬ জন আত্মহত্যাকারীর মধ্যে ৫৮ জন (৮৯%) ছিলো মহিলা। পুরুষের মধ্যে অধিকাংশই ছিলো দিনমজুর বা কৃষক শ্রেণীর, এবং মেয়েদের অধিকাংশই ছিলো গৃহবধু বা গৃহস্থালীসম্পর্কিত কাজে নিয়োজিত (সারণী ২)।

অন্যান্য কারণে মৃত্যুর সাথে তুলনামূলক বিচারে দেখা গেছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যে আত্মহত্যাজনিত কারণে মৃত্যুহার ছিলো বেশি। আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিতের হার ছিলো ৪৯%। পক্ষান্তরে অন্যান্য কারণে যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের মধ্যে এ-হার ছিলো ৩১% (আপেক্ষিক ঝুঁকি = ১.৬; ৯৫% নির্ভরযোগ্যতা = ১.৩-১.৮; পি <০.০০১) (সারণী ২)। দশ থেকে ১৯ বছর বয়সী মৃতদের মধ্যে আত্মহত্যাজনিত কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের মৃতের হার (১৯.৭%) অন্যান্য কারণে তাদের মৃত্যুর (৩০%) তুলনায় কম ছিলো (পি >০.১)।

সারণী ১: আত্মহত্যাজনিত কারণে মৃতদের লিঙ্গভিত্তিক বয়স, বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষা এবং পেশা

শ্রেণীবিন্যাস	পুরুষ (সংখ্যা=৫৩)	মহিলা (সংখ্যা=১০৮)	সর্বমোট (সংখ্যা=১৬১)
বয়স			
১৯ বছর বা তার চেয়ে কম	৮ (১৫%)	৫৮ (৫৪%)	৬৬ (৪১%)
২০-২৯ বছর	২৩ (৪৩%)	৩৬ (৩৩%)	৫৯ (৩৭%)
৩০-৩৯ বছর	৬ (১১%)	৯ (৮%)	১৫ (৯%)
৪০ বছর বা তার চেয়ে বেশি	১৬ (৩০%)	৫ (৫%)	২১ (১৩%)
বৈবাহিক অবস্থা			
অবিবাহিত	১৯ (৩৬%)	৩০ (২৮%)	৪৯ (৩০%)
বিবাহিত	৩৪ (৬৪%)	৭১ (৬৬%)	১০৫ (৬৫%)
বিচ্ছিন্ন/তালাকপ্রাপ্ত/বিধবা	০ (০%)	৭ (৭%)	৭ (৪%)
শিক্ষা			
অশিক্ষিত	২৫ (৪৭%)	৫৭ (৫৩%)	৮২ (৫১%)
প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত	১৭ (৩২%)	৩৬ (৩৩%)	৫৩ (৩৩%)
মাধ্যমিক ও তদুর্ধ	১১ (২১%)	১৫ (১৪%)	২৬ (১৬%)
পেশা			
দিনমজুর	২২ (৪২%)	২ (২%)	২৪ (১৫%)
কৃষক	১২ (২৩%)	০ (০%)	১২ (৭%)
ছাত্র/ছাত্রী	৭ (১৩%)	১২ (১১%)	১৯ (১২%)
ব্যবসায়ী	৭ (১৩%)	১ (০.৯%)	৮ (৫%)
গৃহস্থালীর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি*	০ (০%)	৯১ (৮৪%)	৯১ (৫৭%)
পোষ্য/অক্ষম	৫ (৯%)	২ (২%)	৭ (৪%)

*গৃহবধুসহ

সারণী ২: আত্মহত্যা এবং অন্যান্য কারণে মৃতদের শিক্ষা এবং পেশা (১০ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সের)

শ্রেণীবিন্যাস	আত্মহত্যা (সংখ্যা=১৬১)	অন্যান্য কারণে মৃত (সংখ্যা=১,৯০০)	মোট মৃত (সংখ্যা=২,০৬১)
শিক্ষা			
অশিক্ষিত	৮২ (৫১%)	১,২৯৯ (৬৮%)	১,৩৮১ (৬৭%)
প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত	৫৩ (৩৩%)	৩৮৭ (২০%)	৪৪০ (২১%)
মাধ্যমিক ও তদুর্ধ	২৬ (১৬%)	২১৪ (১১%)	২৪০ (১২%)
পেশা			
দিনমজুর	২৪ (১৫%)	২০৩ (১১%)	২২৭ (১১%)
কৃষক	১১ (৭%)	৪৫৯ (২৪%)	৪৭০ (২৩%)
ছাত্র/ছাত্রী	১৯ (১২%)	৩৫ (২%)	৫৪ (৩%)
ব্যবসায়ী	৮ (৫%)	৯২ (৫%)	১০০ (৫%)
গৃহস্থালীর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি*	৯২ (৫৭%)	৬৪০ (৩৪%)	৭৩২ (৩৬%)
অন্যান্য	৭ (৪%)	৪৭১ (২৫%)	৪৭৮ (২৩%)

*গৃহবধুসহ

তথ্যসূত্র: সার্ভেইল্যান্স এন্ড ডাটা রিসোর্সেস ইউনিট এবং ফিল্ড সাইটস ইউনিট, হেলথ সিস্টেমস্ এন্ড ইনফেকশাস ডিজিজেজ ডিভিশন (এইচএসআইডি), আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকূল্য: ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি)

মন্তব্য

আলোচ্য সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় যে, উল্লেখিত গ্রামীণ পর্যবেক্ষণ এলাকায় মানুষের মৃত্যুর একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে আত্মহত্যা, যা স্ব-প্ররোচিত মৃত্যু হিসাবে জনস্বাস্থ্য-সংক্রান্ত একটা বড় সমস্যার ইংগিতবাহী, বিশেষ করে যুবতীদের মধ্যে।

কেশবপুর এবং অভয়নগর পর্যবেক্ষণ এলাকায় আত্মহত্যাজনিত কারণে মৃত্যুহার চীন এবং হংকং-এর বিশেষ প্রশাসনিক এলাকায় একই কারণে মৃত্যুহারের চেয়ে ১.৭ থেকে ৩ গুণ পর্যন্ত বেশি, যা সেখান থেকে সদ্য প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় (২,৩)। উক্ত পর্যবেক্ষণ এলাকায় আত্মহত্যাজনিত কারণে উচ্চ মৃত্যুহারের কারণ ঠিক পরিষ্কার নয়, এ-ব্যাপারে আরো সমীক্ষা প্রয়োজন।

দক্ষিণ এশিয়ায় আত্মহত্যার ঘটনা যেখানে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি অথচ কম-গুরুত্ববাহী একটি সমস্যা (৪), সেখানে আলোচ্য প্রতিবেদনে উল্লেখিত আত্মহত্যাজনিত কারণে উচ্চ মৃত্যুহার যে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছে তা নয় – কারণ এ-সম্পর্কিত তথ্য বর্তমানে অপর্যাপ্ত। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে এ-সংক্রান্ত মৃত্যুর কারণ এবং ঘটনা গ্রামাঞ্চল থেকে ভিন্ন হতে পারে। চীনের গ্রামাঞ্চলে আত্মহত্যার হার সেখানকার শহরাঞ্চল থেকে ৩ গুণ বেশি (২)। অভয়নগর এবং কেশবপুরের মত বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানেও যদি স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা-সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহ কর্মসূচি পরিচালনা করা যায়, তবে তা সেসব স্থানে আত্মহত্যার ঝুঁকির কারণ এবং এ-সংক্রান্ত মৃত্যুহারের উপর সেখানকার জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং ভৌগলিক অবস্থানের প্রভাব নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে এবং দেশব্যাপী আত্মহত্যার ফলে মৃত্যু-সংক্রান্ত সমস্যার একটা বিশ্বাসযোগ্য হিসাব দাঁড় করানো সম্ভব হতে পারে।

আত্মহত্যা ঠেকানো খুবই প্রয়োজন, তবে তা বেশ কঠিন (চ্যালেঞ্জিং) একটা কাজ, এবং এজন্য স্থানীয় আচার-আচরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নানামুখী কর্মকাণ্ড এবং কলা-কৌশলের সঠিক প্রয়োগ দরকার (৫)। আত্মহত্যাকারীদের সাথে সম্পর্কিত জনসংখ্যা-বিষয়ক বৈশিষ্ট্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আত্মহত্যার এ-প্রবণতা রোধের জন্য নানামুখী কলা-কৌশল প্রবর্তন করা দরকার। আর এ-জন্য যেসব বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা দরকার সেগুলো যুবতীদের ক্ষেত্রে সম্ভবত ভিন্ন রকমের হবে, কেননা আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে বয়স্ক ও কর্মজীবী পুরুষের তুলনায় তাদের সংখ্যা আনুপাতিক হারে অনেক বেশি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, নারী নির্যাতন এবং আত্মহত্যার চেষ্টা হয়তো পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকতে পারে। আর তাই দ্বিতীয় সমস্যাটির (আত্মহত্যাজনিত) সার্থক সমাধানকল্পে প্রথম সমস্যাটির (নারী নির্যাতন) জন্য দায়ী মূল বিষয়সমূহের দিকে প্রথমেই নজর দেওয়া উচিত (৬,৭)। আলোচ্য প্রতিবেদনে উল্লেখিত আত্মহত্যাকারীদের আত্মহত্যার পর তাদের পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রাপ্ত তথ্য থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, আত্ম-প্ররোচনাই তাদের আত্মহত্যার মূল কারণ। তবে উল্লেখিত আত্মহত্যার ঘটনাগুলোর মধ্যে কিছু হত্যার ঘটনা (যেমন কোনো হত্যার ঘটনাকে সাক্ষাৎগ্রহণকারীদের কাছে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে

দেওয়া) থাকার ব্যাপারটিও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আর এসব বিষয়ই আলোচ্য ক্ষেত্রে তথ্য উপস্থাপনা ও ব্যাখ্যায় জটিলতা সৃষ্টি করেছে এবং ভবিষ্যতে আরো সমীক্ষা ও সম্ভাবনাময় ইন্টারভেনশন কর্মসূচি গ্রহণ করার সুযোগ সম্প্রসারিত করেছে।

আত্মহত্যার মূল কারণ এবং আত্মহত্যাজনিত মৃত্যুর অনুমিত বৈশিষ্ট্যসমূহ আরো নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করার জন্য আরো সমীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া আত্মহত্যা সংঘটিত হওয়ার আভাস পাওয়া গেলে বা আত্মহত্যার চেষ্টা করার আশংকা পরিলক্ষিত হলে, ঘটনা ঘটার আগেই কোনো চিকিৎসক বা মানসিক স্বাস্থ্য-সেবাপ্রদানকারীর সাথে যোগাযোগের সুযোগ সৃষ্টি করাও প্রয়োজন (৬)।

বি: দ্র: তথ্য-নির্দেশের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন

নিউমোনিয়ার চিকিৎসায় স্বাস্থ্য-সেবা গ্রহণে বিলম্বের সামাজিক ও লৌকিক প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর একটা বড় কারণ যেখানে নিউমোনিয়া, সেখানে শুধুমাত্র স্বল্প-সংখ্যক শিশু প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য-সেবাপ্রদানকারীদের কাছ থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করে থাকে। নিউমোনিয়া সম্পর্কে পিতা-মাতার অর্জিত বিশ্বাস এ-রোগের চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে কিভাবে প্রভাবিত করে তা বের করার জন্য এ-গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কিছু সাধারণ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে পিতা-মাতা স্থানীয়ভাবে এ-রোগকে 'ঠান্ডা লাগা' হিসাবে জানেন। তারা মনে করেন এটি ঠাণ্ডা খাবার খাওয়া, অথবা ঠাণ্ডা কোনো জিনিসের সংস্পর্শে অধিক ক্ষণ অবস্থান করার ফল। বেশিরভাগ পিতা-মাতাই বলেছেন যে তাঁরা প্রথমে স্ব স্ব বাসা-বাড়িতেই 'শরীর গরম' করার মাধ্যমে এ-রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকেন। আর সম্ভবত এর ফলেই বাড়ির বাইরে চিকিৎসা নেওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব ঘটে থাকে। শিশুদের বয়স ও শারীরিক অবস্থার ভিত্তিতে তাদের স্বাস্থ্য-সেবা গ্রহণের ধরন ভিন্ন হয়ে থাকে। নিউমোনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত শিশুমৃত্যুর হার কমানোর লক্ষ্যে পরিকল্পিত ইন্টারভেনশন কলা-কৌশলের সাথে এ-রোগ-সংক্রান্ত পিতা-মাতার বিশ্বাস ও সীমাবদ্ধতাসমূহ, যেগুলো ত্বরিৎ এবং সঠিক স্বাস্থ্য-সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকস্বরূপ, সেগুলো বিবেচনায় রেখে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

নিউমোনিয়াসহ শ্বাসতন্ত্রের তীব্র সংক্রমণ বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর একটি অন্যতম কারণ। সারা দেশে বিভিন্ন রোগে বছরে যত শিশু মারা যায় তার ২৫% অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিন ৪০০ শিশু এ-রোগে মারা যায় (১,২)। এমনকি নবজাতকের উচ্চ মৃত্যুহারও (প্রায় ৪০%) শ্বাসতন্ত্রের তীব্র প্রদাহের সাথে সম্পর্কিত (১)। অথচ এদের মধ্যে নিউমোনিয়ার লক্ষণ ও উপসর্গ-সম্বলিত মাত্র ৭% শিশু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকের কাছ থেকে সেবা পেয়ে থাকে (শামসু এল আরেফিন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ)। সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা না পাওয়ার কারণে নানা জটিলতা দেখা দেয়, এমনকি শিশুর মৃত্যুও হতে পারে (২)। যেখানে বেশিরভাগ গবেষণাই শ্বাসতন্ত্রের তীব্র সংক্রমণের রোগতাত্ত্বিক অথবা চিকিৎসা-সংক্রান্ত বিষয়াবলির মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেখানে কিছু গবেষণা থেকে আমরা বাংলাদেশে এ-রোগের সাথে সম্পর্কিত ধারণা ও এর চিকিৎসা/সেবা-বিষয়ক চর্চা সম্বন্ধে জানতে পারি (৩,৪)।

কিভাবে অসুস্থতা-সংক্রান্ত প্রচলিত বিশ্বাস গৃহস্থালীতে নিউমোনিয়ার চিকিৎসা গ্রহণ প্রক্রিয়াকে এবং চিকিৎসা গ্রহণে বিলম্ব করাকে প্রভাবিত করে তা পরীক্ষা করার জন্য মতলবে একটি নিবিড় গুণগত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। নিউমোনিয়াকে অথবা নিউমোনিয়ার সাথে সম্পর্কিত লক্ষণ ও উপসর্গসমূহ স্থানীয় লোকজন কী নামে চেনে তাও জানার চেষ্টা করা হয়েছে এবং দেখা গেছে স্থানীয় লোকজনের কাছে এগুলো 'নিউমোনিয়া' হিসাবেই সাধারণত সবচেয়ে বেশি পরিচিত, যাতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ব্যবহৃত বিষয়ের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া নিউমোনিয়ার এ-লক্ষণসমূহকে তাঁরা *শ্বাসকষ্ট* ও *হাঁপানী* হিসাবেও জানে। বিষয়টি জানতে গিয়ে অসুস্থ অবস্থার ২৯টি নামের তালিকা পাওয়া গেছে। এসব উপসর্গের তীব্রতা সম্পর্কে এলাকার লোকদের ধারণা সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার জন্য তাদের ধারণাসমূহকে রেটিং পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হয়েছে। নিউমোনিয়ার তীব্রতা-সম্পর্কিত স্থানীয় লোকজনের ধারণার সাথে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধারণার ঘনিষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে (সারণী ১)।

সারণী ১: নিউমোনিয়ার সাথে সম্পর্কিত লক্ষণ ও উপসর্গের তীব্রতা সম্পর্কে ধারণা

ক্রমানুসারে রোগের তীব্রতা-সংক্রান্ত ধারণা*	নিউমোনিয়ার স্থানীয় পরিভাষা
১	নিঃশ্বাসের সময় বুকের হাড্ডিগুলো বের হয়ে আসে
১	অজ্ঞান হয়ে যায়/চোখ খোলে না
২	বুক উঠা-নামা করে/খাঁচার মধ্যে খাঁজ পড়ে
২	খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে যায়
৩	বুকের দুধ টানতে পারে না
৪	বুকে কফ জমে থাকে
৫	সব সময় শুয়ে থাকতে চায়/খুব দুর্বল
৬	গলার মধ্যে গর্ত হয়
৭	শরীর আগুনের মত গরম
৮	নিঃশ্বাস নিতে পারে না/নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়/শ্বাস টানতে কষ্ট হয়

*পড় নম্বর যখন একই, তখন রোগের তীব্রতা সম্বন্ধে ধারণার সাথে রোগের লক্ষণ ও উপসর্গকে ক্রমানুসারে একই নম্বর দেওয়া হয়েছে।

এতদসত্ত্বেও এমন অনেক স্থানীয় বিশ্বাস ও সামাজিক কারণ আছে, যা প্রাথমিক পরিচর্যাকারী, বিশেষ করে মা-কে তাঁর নিউমোনিয়া-আক্রান্ত শিশুর জন্য তাৎক্ষণিক ও সঠিক স্বাস্থ্য-সেবা গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে। শ্বাসতন্ত্রের তীব্র সংক্রমণ-সংক্রান্ত অসুস্থতার কারণগুলি প্রায়শই মায়ের আচরণের সাথে সম্পর্কিত। শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি ক্ষেত্রে একে গরম/ঠাণ্ডা নিয়ে প্রচলিত বিশ্বাস দিয়ে

ব্যাখ্যা করা হয়। গর্ভাবস্থায় মায়ের ঠাণ্ডা লাগলে তা পরোক্ষভাবে গর্ভের সন্তানের ওপর প্রভাব ফেলে বা সরাসরি ঠাণ্ডার সংস্পর্শে এসে শিশুর ঠাণ্ডা লাগে, অথবা মা বা শিশু ঠাণ্ডা খাবার খেলেও এমনটি হয় মনে করে এ-অবস্থাসমূহকে স্থানীয়ভাবে ঠাণ্ডা লাগা হিসাবে গণ্য করা হয় (সারণী ২)। ঠিকমতো সেবা না দিতে পারার দোষে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ভয়ে মায়েরা তাঁদের সন্তানদের অসুস্থ হওয়ার কথা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জানান না, যতক্ষণ না শিশুর অবস্থা মারাত্মক হয়ে পড়ে। ফলে শরীর গরম করার মতো ঘরোয়া চিকিৎসা-ব্যবস্থা প্রলম্বিত হয় ও উপযুক্ত স্বাস্থ্য-সেবা গ্রহণে অনেক দেরী হয়ে যায়। ঘরোয়া চিকিৎসা-সেবার মধ্যে রয়েছে মা অথবা শিশুর শরীরে সরিষার তেল মালিশ করা। এছাড়া শিশুকে কেরোসিন খাইয়ে দেওয়া বা তার শরীরে কেরোসিন তেল মালিশ করা এবং জ্বরের সময় শিশুকে ভারী কম্বল বা গরম কাপড় দিয়ে পেচিয়ে রাখাসহ সম্ভাব্য ক্ষতিকর কিছু চর্চাও ঘরোয়া চিকিৎসা-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। ঠাণ্ডা খাবার খেলে শিশুর অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যাবে, এমন বিশ্বাস থেকে শিশুকে বুকের দুধ দানকারী মা ও তাঁর শিশুর খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়।

সারণী ২: ঠাণ্ডা বা অন্য কোনো কারণে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাব্য কারণসমূহ সম্পর্কে মানুষের ধারণা

ঠাণ্ডা কিভাবে লেগেছে	নিউমোনিয়ার কারণ সম্পর্কে লোকজনের ধারণা
শারীরিক	*গর্ভবতী মা-এর ক্ষেত্রে* - ধান ক্ষেতে কাজ করার ফল - ঠাণ্ডা জিনিস, যেমন পানি ধরার ফল - অসময়ে গোসল করার জন্য - খালি পায়ে হাঁটার ফল *শিশুর ক্ষেত্রে* - কাদা ও বৃষ্টির পানিতে খেলা করার জন্য - দীর্ঘক্ষণ মাটির মেঝেতে অবস্থান করার ফল - রাতে বিছানায় পেশাব করে ভিজা বিছানায় শুয়ে থাকার জন্য - ঘেমে গিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার ফল
খাবার-বিষয়ক	*শিশুকে বুকের দুধ দানকারী মা-এর ক্ষেত্রে* - বেশি পরিমাণ ঠাণ্ডা খাবার খাওয়ার ফল (বিশেষ করে রাতে) *শিশুর ক্ষেত্রে* - বেশি ঠাণ্ডা খাবার গ্রহণকারী মা-এর বুকের দুধ খাওয়ার ফল - অনেক বেশি পানি পান করার জন্য - অনেক বেশি ঠাণ্ডা খাবার খাওয়ার ফল
অন্যান্য কারণ, যা ঠাণ্ডার সাথে সম্পর্কিত নয়	*গর্ভবতী মা-এর ক্ষেত্রে* - চুল খোলা রেখে এলাকায় হাঁটাহাঁটি করার ফলে আলগা বাতাস লাগা - বুকে আঘাতজনিত কষ্ট *শিশুর ক্ষেত্রে* - *আলগা বাতাস*-এ আক্রান্ত হওয়ার ফল - পড়ে যাওয়ার ফলে বুকে আঘাত পাওয়ার ফল

এমনকি সন্তানের অসুস্থতা যখন গুরুতর এবং তাকে চিকিৎসকের কাছে নেওয়া প্রয়োজন বলে বিবেচনা করা হয় তখনও শিশুর মাকে সাধারণত ঘরের বাইরে চিকিৎসা নিতে যেতে নানা রকম বাধার সম্মুখীন হতে হয় যেমন, গৃহস্থালীর অন্যান্য কাজ করার জন্য মা-কে ঘরে থাকতে বাধ্য করা, এলাকার মধ্যে মা যেখানে খুশি সেখানে না-যাওয়ার ওপর আরোপিত বিধি-নিষেধ, প্রাথমিক সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারী হিসাবে তাঁর স্বামীর অনুপস্থিতি, অন্য সন্তানদের দেখাশুনা করার জন্য ঘরে মায়ের বদলে অন্য কোনো শিশু পরিচর্যাকারীর অনুপস্থিতি, চিকিৎসকের কাছে যেতে মায়ের কোনো সংগী না-পাওয়া, স্বাস্থ্যসেবা নেওয়ার খরচ, অসুস্থ শিশু বাইরে থেকে অন্য কোনো রোগ-ব্যাধি বিশেষ করে *আলগা বাতাস* (অশুভ শক্তি)-এর সংস্পর্শে এসে আরো অসুস্থ হয়ে পড়ার আশংকা, ইত্যাদি।

বিভিন্ন বয়সে রোগের কারণের ভিন্নতা ও যথোপযুক্ত চিকিৎসা-সংক্রান্ত নানারকম বিশ্বাসসহ বিবিধ কারণে সেবা গ্রহণের অভ্যাসের সুস্পষ্ট পার্থক্য আলোচ্য সমীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, সদ্যোজাত শিশুর মধ্যে নিউমোনিয়ার লক্ষণ ও উপসর্গসমূহ অর্থাৎ দ্রুত শ্বাস-নেওয়া, বুকের মধ্যে খাঁজ-পড়া, ইত্যাদি দেখা দিলে তাকে সাধারণত *আলগা বাতাস* হিসাবে মনে করা হয় এবং এসব ক্ষেত্রে শিশুর অভিভাবক প্রথমেই একজন আধ্যাত্মিক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। এছাড়া এলোপ্যাথিক ওষুধ ছোট শিশুদের জন্য খুব শক্তিশালী মনে করে নিউমোনিয়ার লক্ষণ-সম্বলিত শিশুদের সাধারণত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা দেওয়া হয়, কারণ এতে আস্তে আস্তে কাজ করবে বলে বিশ্বাস করা হয়। শুধুমাত্র ৬ মাসের বড় শিশুরা এলোপ্যাথির কঠিন প্রভাব সহ্য করতে পারবে বলে বিশ্বাস করা হয়। এমনকি এসব ক্ষেত্রে একজন দক্ষ চিকিৎসকের পরিবর্তে গ্রামীণ কোনো হাতুড়ে ডাক্তারের কাছ থেকেই প্রথমে চিকিৎসা নেওয়া হয়। স্বাস্থ্য-সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ডাক্তারগণ কেন তাঁদের প্রথম পছন্দ, উত্তরদাতারা তাও ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী চিকিৎসা নেওয়ার জন্য নিম্নোক্ত কারণে গ্রামীণ ডাক্তারগণ তাঁদের প্রথম পছন্দের তালিকায় রয়েছেনঃ

- গ্রামীণ ডাক্তারগণ এলাকার লোকজনের কাছে খুব পরিচিত
- তাঁরা শ্বাসতন্ত্রের তীব্র সংক্রমণের লক্ষণ ও উপসর্গসমূহের চিকিৎসা করতে পারেন
- তাঁরা রোগীর বাড়ির ধারে-কাছেই থাকেন
- ২৪ ঘণ্টাই তাঁরা চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করে থাকেন, এবং
- তাঁরা সেবাগ্রহণকারীর সামর্থ্য অনুযায়ী কম খরচে সেবাদান করে থাকেন।

তথ্যসূত্র: সোশাল এন্ড বিহেভিয়ারাল সায়েন্সেস এন্ড চাইল্ড হেল্‌থ ইউনিট, পাবলিক হেলথ্ সায়েন্সেস ডিভিশন (পিএইচএসডি), আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকুল্য: ইউনাইটেড স্টেটস্ এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) এবং ওয়ার্ল্ড হেলথ্ অরগানাইজেশন

মন্তব্য

ঘরের বাইরে স্বাস্থ্যসেবা নিতে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে ধারাবাহিকভাবে যেসব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়, আলোচ্য প্রতিবেদনে সে-সম্পর্কিত তথ্যাবলি প্রকাশিত হয়েছে। এসব বাধা নিউমোনিয়া রোগীদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকের কাছে পৌঁছাতে অনেক দেরী করিয়ে দেয়। এমনও দেখা গেছে চিকিৎসার জন্য প্রশিক্ষিত চিকিৎসকের কাছে নেওয়ার আগেই শিশুর জীবন চরম ঝুঁকির

সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। প্রায় ক্ষেত্রেই এরকম ঘটনা ঘটে।

স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা ও সঠিক সেবাদানকারীর কাছ থেকে চিকিৎসা না-নেওয়ার ফলে শ্বাসতন্ত্রের তীব্র সংক্রমণজনিত কারণে বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর হার সম্ভবত এখনো অনেক বেশি। নিবিড় গুণগত উপাত্ত চিকিৎসা গ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতার প্রকৃত কারণসমূহ উদঘাটন এবং তার সম্ভাব্য সমাধানের পথ-নির্দেশ দিতে পারে।

এ-প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য ১০ বছর আগে গ্রামীণ বাংলাদেশ নিয়ে পরিচালিত সামাজিক সাংস্কৃতিক গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (৩)। সে-গবেষণায় দেখা গেছে যে, মা-কে শিশুর প্রতি তাঁর অযত্নশীল আচরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হবে – এ-ভয়ে মা শিশুর নিউমোনিয়ার লক্ষণ ও উপসর্গগুলো পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জানাতে খুব আগ্রহ বোধ করেন না, যার ফলে শিশুর জন্য চিকিৎসা-সেবা নিতে দেরী হয়ে যায়। নিউমোনিয়ায় মৃত্যুহার কমানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ইন্টারভেনশন কলা-কৌশলের মধ্যে শিশুর শারীরিক অবস্থার কথা পরিবারের অন্যান্য সিদ্ধান্তগ্রহণকারী ব্যক্তির কাছে গোপন রাখা এবং ত্বরিৎ চিকিৎসা-সেবা নেওয়ার ব্যাপারে মায়ের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। পরিবারের অন্যান্য সদস্য যেমন, বাবা ও দাদী-নানী যাতে শুরুতেই নিউমোনিয়া রোগ সনাক্ত করতে সক্ষম হন এবং চিকিৎসা-সেবা নেওয়ার জন্য যাতে বাড়িতে আরো সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হয়, সে-ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

বিপজ্জনক লক্ষণসমূহ, যার জন্য প্রশিক্ষিত সেবাদানকারীর কাছ থেকে রোগীর দ্রুত চিকিৎসা নেওয়া প্রয়োজন, সে-সম্পর্কে এবং চিকিৎসা নিতে ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ না-করার ফলে সৃষ্ট সমস্যা সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট তথ্য সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে।

এ-গবেষণাপত্রের ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে, নিউমোনিয়া রোগ-সংক্রান্ত স্থানীয় ভাষা ও প্রতিশব্দসমূহ এ-রোগ চেনা ও এর ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধারণার কাছাকাছি। আর সেজন্যই পিতা-মাতা নিউমোনিয়ার লক্ষণ ও উপসর্গ সম্পর্কে অবগত। স্থানীয় পরিভাষা ও সেখানকার মানুষের প্রচলিত জ্ঞানের প্রশংসা করে স্বাস্থ্যকর্মীরা নিউমোনিয়া রোগের চিকিৎসা-সংক্রান্ত কলা-কৌশল ও ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে সেখানে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে আরো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন। অপেক্ষাকৃত কম-বয়সী শিশু, যারা অনেক বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন, তারা যাতে সঠিক সেবা পায় তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যও সরবরাহ করা উচিত।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা বহুমাত্রিক। বর্তমানে শ্বাসতন্ত্রের তীব্র সংক্রমণজনিত রোগীদের ব্যবস্থাপনায় এবং প্রয়োজনীয় সঠিক চিকিৎসা-সেবা নেওয়ার জন্য উপযুক্ত স্থানে পাঠানোর ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণবিহীন চিকিৎসকদের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। তাই এ-রোগসহ শৈশবকালীন অন্যান্য রোগ-সংক্রান্ত সমস্যা নিরসনে প্রয়োজনীয় কলা-কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ডাক্তার ও সনাতন চিকিৎসকদের অন্তর্ভুক্ত করলে তা ফলপ্রসু হবে বলে আশা করা যায়।

বি: দ্র: তথ্য-নির্দেশের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন

সতর্কবার্তাঃ বাংলাদেশে মাল্টিড্রাগ-রেজিস্ট্যান্ট (একাধিক ওষুধ-প্রতিরোধকারী) *শিগেলা ডিসেন্টারী* টাইপ ১-এর বিবর্তন – সম্ভাব্য মহামারীর প্রতি অব্যাহত সতর্ক দৃষ্টি রাখার প্রয়োজনীয়তা

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা-এর গত সংখ্যায় *শিগেলা ডিসেন্টারী* টাইপ ১-এর (*এসডি১*) জীবাণু দ্বারা রক্ত-আমাশয়-এর একটি বড় ধরনের মহামারীর সম্ভাব্য আশংকা ব্যক্ত করে, ঢাকা ও মতলবের রোগীদের মধ্যে সিপ্রোফ্লোক্সাসিন-প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন *এসডি১*-এর একটি ক্লোন সনাক্ত করা সম্পর্কে একটি সতর্কবার্তা প্রকাশিত হয়েছিল। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে *এসডি১* জীবাণু দ্বারা সংঘটিত রোগের একটি প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে।

২০০৩ সালের নভেম্বর মাসের শেষদিকে সিলেটের এক চা-উৎপাদনকারী এলাকার ৩ বছর-বয়সী একটি শিশু রক্ত-আমাশয়, রেকটাল প্রোলাপ্স (পায়ুপথে মলদ্বার বের হয়ে আসা) এবং পেরিফেরাল এডেমা (হাত-পা ফুলে-যাওয়া) নিয়ে আইসিডিডিআর,বি-র ঢাকা হাসপাতালে ভর্তি হয়। তার পায়খানার নমুনা পরীক্ষা করে ফ্লুরোকুইনোলোন-এর বিরুদ্ধে কার্যকর *এসডি১* জীবাণু সনাক্ত করা হয়। রোগীর পরিবার থেকে জানা যায় যে, ঐ পরিবারের বেশ ক'জন সদস্যসহ চা-বাগানে বসবাসকারী তাদের প্রতিবেশীদের মধ্যেও রক্ত-আমাশয় দেখা দিয়েছিলো।

২০০৩ সালের ১১ ডিসেম্বর তারিখে আইসিডিডিআর,বি থেকে একটি অনুসন্ধানী দল *এসডি১*-এর সংক্রমণের সন্দেহ নিশ্চিত করার জন্য সিলেটের উক্ত চা-উৎপাদনকারী এলাকা পরিদর্শন করে। এই অনুসন্ধানী দলটি এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে ৪ জনকে সনাক্ত করে যারা রক্ত-আমাশয়ে আক্রান্ত ছিলো। এদের মধ্যে ৩ জন ছিলো ৫ বছরের কম-বয়সী শিশু এবং ১ জন ২১ বছর-বয়সী। প্রাপ্তবয়স্ক এ-রোগী তখনো কোনো এন্টিবায়োটিক ওষুধ গ্রহণ করে নি এবং তাঁর রেকটাল সোয়াব পরীক্ষা করে *এসডি১* জীবাণু সনাক্ত করা হয়, যা এম্পিসিলিন, কোট্রাইমোক্সাজোল, নালিডিক্সিক এসিড, টেট্রাসাইক্লিন, সিপ্রোফ্লোক্সাসিন, নরফ্লোক্সাসিন ও অফ্লোক্সাসিন-এর বিরুদ্ধে কার্যকর ছিলো এবং এজিথ্রোমাইসিন, পিভমেসিলিনাম এবং সেফট্রিআক্সোন-এর প্রতি সংবেদনশীল ছিলো। তিনজন শিশুর সকলকেই এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছিলো এবং তাদের রেকটাল সোয়াব পরীক্ষা করে কোনো জীবাণু পাওয়া যায় নি।

এই চা-উৎপাদনকারী এলাকার পরিবারগুলোকে যে দু'জন ব্যক্তি স্বাস্থ্য-সেবা প্রদান করেন তাঁদের কাছ থেকে জানা যায় যে, অক্টোবর মাসের প্রথম থেকে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় ৫০ জন রোগীকে তাঁরা রক্ত-আমাশয়ের চিকিৎসা প্রদান করেছেন। তথ্য অনুযায়ী, রক্ত-আমাশয়ের লক্ষণ শুরু হওয়ার পর ৪ জন মৃত্যুবরণ করে যাদের মধ্যে ২ জন যুবক ও ২ জন ৫ বছরের কম-বয়সী শিশু ছিলো। তবে জেলা ও উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, উল্লেখিত এলাকার সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহে সম্প্রতি রক্ত-আমাশয় রোগীর সংখ্যা বাড়ে নি।

এই অনুসন্ধানের ফলাফল থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মাল্টিড্রাগ-রেজিস্ট্যান্ট *শিগেলা ডিসেন্টারী* টাইপ ১-এর একটি ক্লোন দ্বারা রোগ-সংক্রমণ অব্যাহত রয়েছে। রক্ত-আমাশয় রোগীদের চিকিৎসা প্রদান করার সময় উক্ত রোগীরা *এসডি১* জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হয়েছে সন্দেহ করে বাংলাদেশের চিকিৎসকদের চিকিৎসা করা উচিত। সম্ভব হলে রোগীর পায়খানার কালচার (পরীক্ষা) করে রোগ-জীবাণু নির্ণয় ও ওষুধের প্রতি তার সংবেদনশীলতা পরীক্ষা করে দেখা উচিত। কালচারের ফলাফল থেকে কয়েকজন ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে বলে নিশ্চিত হলে,

তা স্থানীয় সরকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের দ্রুত অবহিত করা উচিৎ হবে। কালচার করার সুযোগ না থাকলে সন্দেহজনক রক্ত-আমাশয় রোগীদের তথ্য পেলেই তা উপজেলা ও জেলা সদরের সরকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের জানানো উচিৎ হবে।

২০০২ এবং ২০০৩ সালে এই অঞ্চলে যে *এসডি১* জীবাণু পাওয়া গিয়েছিলো তা অফ্লোক্সাসিনের প্রতি সংবেদনশীল ছিলো, তবে সিলেটের অধিবাসীদের মধ্য থেকে সনাক্ত-করা জীবাণুটি সবধরনের ফ্লুরোকুইনোলোন ওষুধের বিরূদ্ধে কার্যকর হওয়াতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এই জীবাণুটির ক্রমাগত বিবর্তন হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে একটি বড় ধরনের মহামারী দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকার দরুন আগামী মাসগুলোতে এন্টিবায়োটিক ওষুধের প্রতি জীবাণুটির সংবেদনশীলতা পর্যবেক্ষণ করা অপরিহার্য।

অফ্লোক্সাসিন ওষুধের বিরুদ্ধে কার্যকর *এসডি১* জীবাণুর এই ক্লোনটির উত্থানের দরুন এই রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা উভয়-সংকটে পড়েছেন। *এসডি১* জীবাণুর যে-ক্লোনটি এই অঞ্চলে বর্তমানে অবস্থান করছে তা স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় এমন ২টি ওষুধ পিভমেসিলিনাম এবং এজিথ্রোমাইসিন-এর প্রতি সংবেদনশীল। *এসডি১*-এর চিকিৎসায় এজিথ্রোমাইসিনের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে দেখা হয় নি। তবে পিভমেসিলিনাম-এর প্রতি সংবেদনশীলতা এখনো বর্তমান থাকার দরুন বাংলাদেশে *এসডি১* রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে পিভমেসিলিনাম-কেই পছন্দের ওষুধ হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে, যা কমপক্ষে ৩ দিন ধরে প্রয়োগ করা উচিত। এটি সর্বজনবিদিত যে, *এসডি১* জীবাণুটি এন্টিবায়োটিক ওষুধের বিরুদ্ধে দ্রুত প্রতিরোধ-ক্ষমতা তৈরি করতে পারে। সেক্ষেত্রে চিকিৎসক ও ফার্মাসিস্টগণ বিবেচনার সাথে সঠিক ওষুধের ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে যে সীমিত-সংখ্যক ওষুধ এখনো কার্যকর রয়েছে তার কোনো একটির বিরুদ্ধে জীবাণুটির প্রতিরোধ তৈরির ক্ষমতাকে বিলম্বিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

বি: দ্র: তথ্য-নির্দেশের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন

সর্বশেষ পর্যবেক্ষণ

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা'র প্রতিসংখ্যায় পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ-বিষয়ক উপাত্তের হালনাগাদ তথ্য পরিবেশন করা হয়। এই হালনাগাদকৃত সারণী এবং চিত্রগুলোতে প্রকাশনাকালীন সময়ে প্রাপ্ত সর্বশেষ পর্যবেক্ষণ কর্মসূচির তথ্যগুলো প্রতিফলিত হবে। আমরা আশা করছি, রোগ বিস্তারের বর্তমান ধরন এবং রোগের ওষুধ প্রতিরোধ সম্পর্কে আগ্রহী স্বাস্থ্যগবেষকদের কাছে এই তথ্যগুলো সহায়ক হবে।

জীবাণুনাশক ওষুধের প্রতি ডায়রিয়া জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: মে-অক্টোবর ২০০৩

জীবাণুনাশক ওষুধ	*শিগেলা* (সর্বমোট ১৭৬)	*ভি. কলেরি O১* (সর্বমোট ৩২৯)	*ভি. কলেরি O১৩৯* (সর্বমোট ১৬)
নালিডিক্সিক এসিড	৪৩.২	পরীক্ষা করা হয় নি	পরীক্ষা করা হয় নি
মেসিলিন্যাম	৯৮.৯	পরীক্ষা করা হয় নি	পরীক্ষা করা হয় নি
এম্পিসিলিন	৪৪.৯	পরীক্ষা করা হয় নি	পরীক্ষা করা হয় নি
টিএমপি-এসএমএক্স	৩৩.৫	০.০	১০০.০
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৯৮.৩	১০০.০	১০০.০
টেট্রাসাইক্লিন	পরীক্ষা করা হয় নি	১০০.০	১০০.০
এরিথ্রোমাইসিন	পরীক্ষা করা হয় নি	১০০.০	১০০.০
ফুরাজোলিডিন	পরীক্ষা করা হয় নি	০.০	১০০.০

১৫৩টি এম. টিউবারকিউলোসিস জীবাণুর ওষুধের প্রতি প্রতিরোধের ধরন: অক্টোবর ২০০২-সেপ্টেম্বর ২০০৩

ওষুধ	প্রতিরোধের ধরন		
	প্রাইমারী (সর্বমোট ১২০)	একোয়ার্ড* (সর্বমোট ৩৩)	মোট (সর্বমোট ১৫৩)
স্ট্রেপটোমাইসিন	৫৮ (৪৮.৩)	২০ (৬০.৬)	৭৮ (৫১.০)
আইসোনায়াজিড (আইএনএইচ)	১৭ (১৪.২)	৭ (২১.২)	২৪ (১৫.৭)
ইথামবিউটল	৫ (৪.২)	৭ (২১.২)	১২ (৭.৮)
রিফামপিসিন	৪ (৩.৩)	৪ (১২.১)	৮ (৫.২)
এমডিআর (আইএনএইচ+রিফামপিসিন)	৪ (৩.৩)	৪ (১২.১)	৮ (৫.২)
অন্যান্য ওষুধ	৬০ (৫০.০)	২০ (৬০.৬)	৮০ (৫২.৩)

( ) শতকরা হার
*১ মাস বা তার বেশি যক্ষার ওষুধ গ্রহণ করেছে

প্রতিমাসে প্রাপ্ত ভি. কলেরি ০১, ভি. কলেরি ০১৩৯, শিগেলা এবং রোটাভাইরাসের তুলনামূলক চিত্র: মে-অক্টোবর ২০০৩

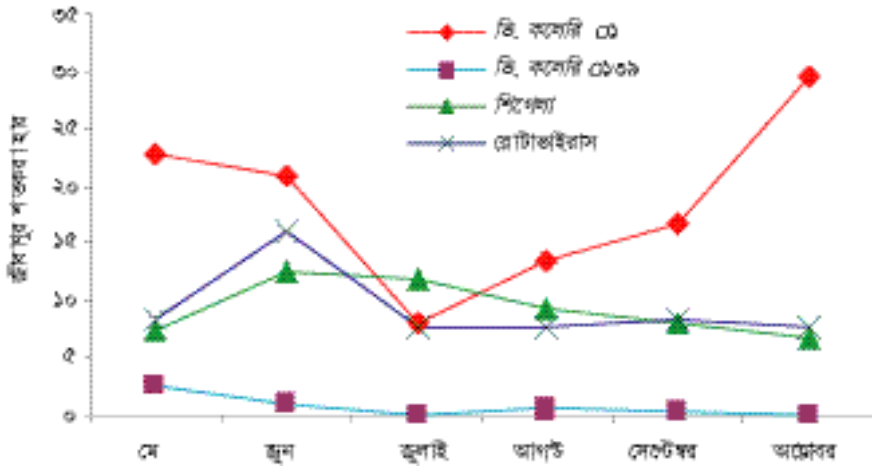

জীবাণুনাশক ওষুধের প্রতি এন. গনোরিয়াই জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: আগস্ট-অক্টোবর ২০০৩ (সংখ্যা=৬৩)

জীবাণুনাশক ওষুধ	সংবেদনশীল (%)	মাঝামাঝি কার্যকর (%)	রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা (%)
এজিথ্রোমাইসিন	৮৭.৩	১২.৭	০.০
সেফট্রিয়াক্সোন	১০০.০	০.০	০.০
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৭.৯	১.৬	৯০.৫
পেনিসিলিন	২২.২	২৭.০	৫০.৮
স্পেক্টিনোমাইসিন	১০০.০	০.০	০.০
টেট্রাসাইক্লিন	৪.৮	৭.৯	৮৭.৩

উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বাস্থ্যসমস্যা নিরসনে আইসিডিডিআর,বির অংগীকারের সাথে সহমর্মী দেশ ও সংস্থাগুলোর কাছ থেকে আইসিডিডিআর,বি অবারিতভাবে আর্থিক সহায়তা পেয়ে আসছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, বেলজিয়াম, কানাডা, জাপান, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, শ্রীলংকা, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সাহায্য সংস্থা।

সম্পাদকমন্ডলি: রবার্ট ব্রাইম্যান এবং পিটার থর্প
সম্পাদনা বোর্ড: বরকত-এ-খোদা, চার্লস লারসন এবং এমিলি গারলী
কপি সম্পাদনা ও বাংলা অনুবাদ: সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
বাংলা সম্পাদনা: এম এ রহীম ও সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদ: আলী আশরাফ, এম এ কাইয়ুম,
আলিয়া নাহিদ, রাশেদা খানম এবং ফাহমিদা তোফায়েল
ডেস্কটপ পাবলিশিং: মোঃ মাহবুব-উল-আলম

আইসিডিডিআর,বি: সেন্টার ফর হেলথ্ এ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ
জিপিও বক্স নং ১২৮
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
www.icddrb.org